وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا
الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ
اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ
عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا
يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ
اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ
الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿١٣﴾

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴿٤﴾

(১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (১২) হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (১৩) মুমিনগণ, আল্লাহ্ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।

সূরা আছ-ছফ্

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান। (২) মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? (৩) তোমরা যা করনা, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (৪) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।

আসল অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহবন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণযোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে।

كَوَافِرُ শব্দটি كَافِرَةٌ এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো হয়েছে। কেননা, কিতাবী কাফের রমণীকে বিবাহ্ করা কোরআনে সিদ্ধ রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেয়া হল। এখন কোন মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখনও কোন-মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর কোন মুশরিক স্ত্রী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর বিবাহে দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।—(মাযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পারিভাষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা, আয়াত বলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا অর্থাৎ, যখন মুসলমান নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দেয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফের থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেয়া কাফেরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেন-দেনের মীমাংসা করে নেয়া কর্তব্য। উভয়পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেন-দেন করে নেয়া উচিত।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ .....

عَاقَبْتُمْ শব্দটি معاقبة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেয়াও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে। (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফেরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেয়া কাফেরদের জন্যে জরুরী ছিল, যেমন মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফের স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফেরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক কর, তবে এর বিধান এই যে,

فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا অর্থাৎ, তোমরা মুহাজির নারীদের দেয়া আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফেরদের হাতে রয়ে গেছে।

عَاقَبْتُمْ এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফেরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফেররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে।—(কুরতুবী)

নারীদের আনুগত্যের শপথ ঃ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়েদসহ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতদৃষ্টে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ্ বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমায়মা বর্ণনা করেন ঃ আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فيما استطعتن واطقتن অর্থাৎ, আমরা এসব বিষয় পালনে অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। ওমায়মা এরপর বলেন ঃ এথেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না—(মাযহারী)

সহীহ্ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এই শপথ সম্পর্কে বলেন ঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে—হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাত কখনও কোন গায়র মাহ্রাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।—(মাযহারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হোদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয় ; বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কাবিজয়ের দিনও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাক্যাবলী নীচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন।

তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশতঃ নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।—(মাযহারী)

يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ মহিলাদের জন্য শপথের প্রথম বিষয় ছিল ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও ছিল। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্বামীর ধন-সম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত ছিল। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা পাকাপোক্ত হলে পুরুষদের জন্যেও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা।

মূর্খতাযুগে কন্যাসন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ না করা। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে একথাও আছে যে, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ অর্থাৎ, নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ না করে। এর কারণ এই যে, কেয়ামতের দিন মানুষের হস্ত-পা-ই তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপকর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে, وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ অর্থাৎ, তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে কোন কাজের আদেশ দিবেন, তা ভাল না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় 'ভালকাজে' কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুলমানরা যেন ভাল করে বোঝে নেয় যে, আল্লাহ্র আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয় ; এমনকি, সেই মানুষটি যদি রসূলও হন, তবুও নয়। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরূপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শয়তান কারও মনে পথভ্রষ্টতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারত। এই পথ বন্ধ করার জন্যে শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।

সূরা আছ-ছফ্

শানে-নুযূল ঃ তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদল সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বগভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্যে জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।—(মাযহারী)

ইবনে-কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (ফলে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।) তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদেরকে সমগ্র সূরা ছফ্ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জেহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মুমিনের জন্যে এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কি না, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কব্জায় নয়। এ কারণেই কোরআন পাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে,

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۚ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۭ فَلَمَّا جَاۗءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا
هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٦ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٧ يُرِيْدُوْنَ
لِيُطْفِـــُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨
هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ
كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝٩ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰي تِجَارَةٍ
تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝١٠ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٢
وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۭ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٣

(৫) স্মরণ কর, যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৬) স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বলল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল ঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে ; তার চাইতে অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৮) তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (১০) মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম ; যদি তোমরা বোঝ। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। (১৩) এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।

আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ্ অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছেঃ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ সাহাবা কেরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যতঃ তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহ্‌র কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, ইনশাআল্লাহ্ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٣

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ, এটা একটা মিথ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে হতে পারে। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ করার দাবী করা দাসত্বের পরিপন্থী। প্রথমতঃ তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতাবশতঃ বলার দরকার হলেও ইন্‌শাআল্লাহ্ সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃত হয়েছে ; অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ অর্থাৎ, যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়, যা আল্লাহ্‌র শত্রুদের মোকাবেলায় তাঁর বাণী সমুন্নত করার জন্যে কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা লাগানো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ এবং শত্রুদের নির্যাতন সহ্য করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলমানদেরকে জেহাদ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হযরত মূসা ও ঈসার (আঃ) ঘটনাবলীতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং দিক নির্দেশ রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী-ইসরাঈলকে তাঁর নবুওয়ত মেনে নেয়ার ও আনুগত্য করার দাওয়াত দেন, তখন বিশেষভাবে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেন। (এক) তিনি কোন অভিনব রসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেননি বরং এমনসব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এ পর্যন্ত বলে এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবে উল্লেখিত আছে। পরে যে সর্বশেষ পয়গম্বর আগমন করবেন, তিনিও এ ধরনের দিকনির্দেশ নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বনী-ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব একটিই ছিল। নতুবা পয়গম্বরগণ পূর্ববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত যদিও

স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তার অধিকাংশ বিধি-বিধান মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত ও তওরাতের অনুরূপ। স্বল্পসংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমণকারী রসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সততার দাবী।

সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রসূলের নাম-ঠিকানাও ইঞ্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী-ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ বাক্যে তাই বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই রসুলের নাম বলা হয়েছে আহ্মদ। আমাদের প্রিয় শেষনবী (সাঃ)-এর মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইঞ্জীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবতঃ এই যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহ্মদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরই বিশেষ নাম ছিল।

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহ্র পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার গোনাহ্ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন নেয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নেয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছে ঃ

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - وَأُخْرَىٰ শব্দটি نِعْمَتَ এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নেয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই; ইহকালেও একটি নগদ নেয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ, শত্রুদের বিজিত হওয়া। এখানে قَرِيبٌ শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قَرِيبٌ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খয়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تُحِبُّونَهَا অর্থাৎ, তোমরা এই নগদ নেয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। কোরআনে বলা হয়েছে। وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا অর্থাৎ, মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নেয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নেয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নেয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেয়া হবে।

كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ

حواريين শব্দটি حوارى এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। যারা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে حوارى বলা হত। সূরা আল-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বার জন। এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর আমলের একটি ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে দ্বীনের সাহায্যের জন্যে তৈরী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন ঃ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বার জন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব মুসলমানদেরকেও আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।